ফ্যাসিবাদের নানা কথা

লাতিন ফাসেস (Fasces) ও ইতালিয়ান ফ্যাসিও (Fascio) শব্দ থেকে পাওয়া ফ্যাসিসমোর (Fascismo) ইংরেজি-প্রতিশব্দ ফ্যাসিজম (Fascism), বাংলায় যাকে বলা হয় ফ্যাসিবাদ। সাধারণভাবে ফ্যাসিবাদ বলতে যে কোনো ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী, অগণতান্ত্রিক, উদারতাবাদ ও সমাজতন্ত্রবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকেই বোঝানো হয়ে থাকে। ব্যাপক অর্থে 'ফ্যাসিবাদী' কথাটি অনেকসময় সমষ্টি রাষ্ট্রের (Totalitarian State) প্রবক্তা প্লেটো ও হেগেল সম্পর্কেও ব্যবহৃত। কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক আলোচনায় এটি একটি নিন্দাত্মক শব্দ। ঐতিহাসিক অর্থে, দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ইতালির একনায়ক মুসোলিনির আদর্শকেই ফ্যাসিবাদ বলা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আর্থ-সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত ইউরোপে তীব্র হতাশা ও তিক্ত অভাববোধের পটভূমিতে এই ভাবাদর্শের জন্ম হয়েছিল। সবরকমের বিরুদ্ধমতের প্রতি নিষ্ঠুর অসহিষ্ণুতায় পুঁজিবাদী শোষণরক্ষার সংকল্প ও অন্ধ জাত্যভিমান এই আদর্শকে ক্রমশই আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক সাম্রাজ্যবাদে পরিণত করেছিল।

তবে তত্ত্ব হিসেবে ফ্যাসিবাদ গণতন্ত্র বা সাম্যবাদের মতো সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত নয়। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, ফ্যাসিবাদ কর্মপ্রধান, সুসম্বদ্ধ তত্ত্বগঠন তার লক্ষ্য বা কাজ নয়। তাছাড়া জাতীয় ভাবের ওপর ভিন্ন ভিন্ন দেশের ফ্যাসিস্ট আন্দোলন নির্ভরশীল বলে তাদের পার্থক্যও বেশি চোখে পড়ে। তবুও মতবাদ হিসেবে ফ্যাসিজম-এর বিশ্লেষণ অসম্ভব নয়। ইতালির দার্শনিক জেন্টিলে ফ্যাসিসমোর বিবরণ দিয়েছেন, মুসোলিনিও তাঁর রচনায় এর মূল ধারণাগুলোর পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছেন। জার্মানিতে হিটলার তার আত্মজীবনীতে নিজের চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, ব্রুক, স্টাপেন রোজেনবার্গ প্রভৃতি নাৎসি প্রচারকদের লেখাতেও ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিক দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

ফ্যাসিস্ট মতবাদের প্রথম কথাই হল রাষ্ট্রশক্তির সর্বব্যাপিতা (all-pervasiveness)। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত "Doctrime of Fascism" শীর্ষক রচনায় মুসোলিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, ইতিহাসের অমোঘ নিয়ন্ত্রণ ও ইতিহাসের ধারক রাষ্ট্রকাঠামোর বাইরে মানুষের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। জাতি রাষ্ট্রগঠন করে না, রাষ্ট্রই ঐক্যবদ্ধ জাতির সৃষ্টি করে এবং জাতির সমষ্টিগত ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। সুতরাং প্রতিটি মানুষের আর্থ-সামাজিক, নৈতিক, আত্মিক

ও বৌদ্ধিক জীবন সবসময়েই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সমাজে সেই জাতীয় মূল্যবোধ ও জ্ঞানের প্রসার কাম্য যা সর্বব্যাপী রাষ্ট্রকর্তৃত্বের পক্ষে সহায়ক ও মঙ্গলজনক। ইতালিতে মুসোলিনির আমলে নাগরিকের শিক্ষা, কর্মপদ্ধতি ও কর্তব্য নির্ধারিত হত রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে। বেতার, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, নাট্যমঞ্চ—প্রভৃতি প্রতিটি জনপ্রচারমাধ্যমকে একই উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হত। ফ্যাসিবাদী নৈতিকতার বিরোধী সব প্রচার বন্ধ করে দিয়ে শুধু ফ্যাসিস্ট মূল্যবোধ গড়ে তোলাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

ফ্যাসিবাদের দ্বিতীয় লক্ষণ হল, একনায়কের সর্বাধিপত্য। ফ্যাসিস্ট নেতৃত্বের মতে, মানুষ সকলে সমান নয়, সকলের সমানাধিকারও বাঞ্ছনীয় নয়, সংখ্যাধিক্যের আধিপত্যের বদলে জাতি ও রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজন উপযুক্ত নেতার। নেতার আবির্ভাব হলে সকলের কর্তব্য কোনো প্রশ্ন না তুলে তার নির্দেশ অনুসারে মৃত্যুপণ করে কাজে আত্মনিয়োগ। এই কারণেই জার্মানিতে হিট্লারের হাতে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি ন্যস্ত হয়েছিল, এবং এইজন্যই ইতালিতে প্রচার করা হয়েছিল, সর্বাধিনায়ক মুসোলিনি কখনো ভুল করতে পারেন না। নেতৃত্বের প্রতি কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ আনুগত্যই ছিল অবশ্যমান্য শর্ত।

মতবাদ হিসেবে ফ্যাসিবাদ ছিল পুরোপুরি সমাজতন্ত্রবিরোধী। মুসোলিনি অবশ্য প্রথম জীবনে চরমপন্থী সমাজতন্ত্রী হিসেবেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং হিটলারের দলও "জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদী দল" নামে অভিহিত ছিল। কিন্তু তবুও শুধু আচরণে নয়, মতাদর্শগত দিকেও সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে ফ্যাসিবাদের পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্কসবাদের গোড়ার ধারণাগুলোকে ফ্যাসিবাদ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছিল। মার্কসের মতে, প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিকশ্রেণীই ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের মূল উপাদান, কিন্তু ফ্যাসিস্টদের মতে, সমাজের ভিত্তি মধ্যবিত্ত ও কৃষকশ্রেণী। মার্কসের প্রধান কথা ছিল এই যে, সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং শ্রেণীসংগ্রামই ইতিহাসের মূল সূত্র। ফ্যাসিবাদের বক্তব্য এর বিরোধী ঃ সংঘর্ষ নয়, জাতীয় ঐক্যই আদর্শ ও আসল সত্য। এই জাতিগত স্বার্থের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থ লোপ পেয়ে সামঞ্জস্যের রূপ গ্রহণ করে। ফ্যাসিস্ট মতে, জাতিই (Race/Nation) হচ্ছে ইতিহাসের প্রধান উপাদান। জাতীয় চরিত্র ও প্রবৃত্তির স্থান আর্থিক বিধিব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং রাষ্ট্র কোনো শ্রেণীবিশেষের আধিপত্যের যন্ত্র নয়, রাষ্ট্রের একটা নৈতিক স্বরূপ ও বিশিষ্ট সত্তা আছে। স্বতন্ত্র শ্রমিকদল গঠন, স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব, সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আদর্শ সম্বন্ধে প্রচার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর আক্রমণ—এর কোনোটিই ফ্যাসিবাদ সমর্থন করেনি। মার্কসবাদীরাই ফ্যাসিবাদের প্রধান শত্রু হলেও আদর্শনিষ্ঠ সোস্যাল

ডেমোক্র্যাটরাও তাঁর আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। ফ্যাসিবাদ ছিল সব রকমের সমাজতন্ত্রেরই সম্পূর্ণ বিরোধী।

গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতিবাদ এবং উদারনীতির বিরোধিতা ফ্যাসিবাদের আর এক বিশেষত্ব। ফ্যাসিস্টরা যখন নবযুগ প্রবর্তনের কথা বলত, তখন তারা গণতন্ত্রের অবসানের ওপর খুব জোর দিত। ফ্যাসিস্ট মতবাদ অনুসারে, সমাজের সাধারণ মানুষ স্বভাবত অজ্ঞ, নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নয় সুতরাং সব মানুষের সমান রাষ্ট্রিক অধিকার এবং সংখ্যাধিক্যের মতে রাজ্যশাসন অন্যায় ও অমঙ্গলজনক, তাতে জাতি বা সমাজের কল্যাণের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় আর দেশের ইষ্টসাধনের জায়গা নেয় নানা স্বার্থের অনুসন্ধান ও সংঘাত। সুতরাং অজ্ঞ সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর সচেতন, বিজ্ঞ নেতৃত্বের আধিপত্যই ফ্যাসিবাদের কাম্য। জনমতের প্রতিভূ কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে শাসকদের দায়িত্ব স্বীকার কিংবা জবাবদিহি করার কোনো প্রয়োজন ফ্যাসিবাদ মেনে নেয়নি।

তবে ফ্যাসিবাদীরা এই ঘোষণায় সব সময়েই তৎপর ছিল যে, ইউরোপের আধুনিক রাজনৈতিক মতবাদগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা মানেই যন্ত্রযুগ ও ফরাসি বিপ্লবের আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া নয়। ফ্যাসিবাদে বলা হয়েছিল, পুরোনো ব্যবস্থার পুনঃস্থাপনা নয়, প্রগতির পথে সময়োপযোগী নতুন যুগের সূত্রপাতই এর লক্ষ্য। ফ্যাসিস্ট নেতৃত্ব এইজন্য সযত্নে পুরোনো যুগের ধারণাগুলো থেকে তাদের ধারণার পার্থক্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল। প্রাক-ফরাসি বিপ্লব যুগের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের অধিকার ফ্যাসিস্টরা স্বীকার করেনি, উত্তরাধিকার সূত্রে আভিজাত্য প্রথার ওপরেও তাদের বিশেষ আস্থা ছিল না। মধ্যযুগে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলোর যে আধিপত্য ছিল, ফ্যাসিবাদ তার পুনরুত্থানের বিরোধী। ফ্যাসিস্টরা ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিল, কিন্তু চার্চের প্রভুত্ব ও স্বতন্ত্র প্রভাব বিস্তার তাদের মনঃপূত ছিল না। রাষ্ট্রের একটা নৈতিক রূপ ও স্বতন্ত্র জীবন আছে, ধর্ম ও নীতিতে বিশ্বাস ব্যক্তিগত রুচির কথা নয়, জাতির জীবনে জাতির একটা বিশেষ ধর্ম ও ঐতিহ্য থাকা প্রয়োজন—ফ্যাসিস্ট মতবাদ এইসব বিশ্বাসের সমর্থক ছিল। কিন্তু রাষ্ট্র থেকে আলাদা কোনো প্রভাবশালী ধর্মপ্রতিষ্ঠান আদৌ কাম্য ছিল না। ইতালিতে ক্যাথলিক ধর্মকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবন সম্ভব ছিল না, কিন্তু ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তি রোমান ক্যাথলিক চার্চের ওপর আস্থা হারিয়েছিল। জার্মানিতেও নানাভাবে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নাৎসি দলের করায়ত্ত করার চেষ্টা হয়েছিল।

উগ্র একজাতীয়তাবাদ ছিল ফ্যাসিজম-এর আর একটি প্রধান অঙ্গ। এই জাতিগর্বের ভিত্তি ছিল তাদের অতীত ইতিহাস। ইতালীয় ফ্যাসিস্টদের নিজস্ব সম্পদের মধ্যে

প্রধান ছিল রোমান সাম্রাজ্যের স্মৃতি ও রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকারিত্বের গৌরব। অন্যদিকে জার্মান নাৎসিদের বিশিষ্ট বিশ্বাস ছিল নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্বে। জার্মান জাত্যভিমান শেষপর্যন্ত পরিণত হয়েছিল ইহুদিবিদ্বেষে। প্রথমদিকে না হলেও ১৯৩৬-৩৭ সালের পর মুসোলিনিও ইহুদিবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য এর পেছনে আদর্শগত কারণ ছাড়া অন্য কারণও ছিল। ইহুদি বিরোধিতার মাধ্যমে মুসলিম জগতের সমর্থন আদায় ও ধনী ইহুদিদের সম্পত্তি গ্রাস করে আর্থিক সুবিধালাভ ছিল মুসোলিনির অন্যতম উদ্দেশ্য।

মুসোলিনি ও তাঁর সহগামীরা তাদের এই উগ্র মতাদর্শকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রিস, জাপান, পর্তুগাল ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়েও পড়েছিল এই মতবাদ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমঝোতা ছিল লক্ষণীয়। জার্মানি ও ইতালি বেশ কিছু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে জাপানও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ১৯৩৯ সালের মে মাসে ইতালি ও জার্মানি সরাসরি প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক সামরিক জোট গঠন করে। ঐ বছরেই রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ইতালির পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে, তবে শীঘ্রই, ১৯৪০-এর ২৭ সেপ্টেম্বর, জার্মানি, ইতালি ও জাপান মিলিত জোট গঠন করে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা করে।

তবে শেষপর্যন্ত গোটা বিশ্বের প্রগতিবাদী মানুষের গরিষ্ঠাংশ এই নেতিবাচক মতবাদটির বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে ওঠে। প্রচারে যত কথাই বলা হোক না কেন, ফ্যাসিবাদ কোনো নির্দিষ্ট যৌক্তিক কাঠামোর মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, তাই শেষ বিচারে বৃহত্তর সমাজ একে বর্জন করেছিল। ইতালির বিখ্যাত দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচে ফ্যাসিবাদকে "কিছু আবেদনের অসংলগ্ন ও অদ্ভুত মিশ্রণ" বলে সমালোচনা করেছিলেন। আলবের্তো মোরাভিয়ার উপন্যাসে যে ফ্যাসিবাদী বাস্তবের চিত্র পাওয়া যায়, তাতে ক্রোচের বিদ্রূপের সমর্থন মেলে।

গোড়ার দিকে ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র দুটোকেই আক্রমণ করে তৃতীয় কোনো পথের সন্ধান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে বোঝা যায় যে, প্রধানত সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রাখাই-এর উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলন ও রুশ কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অভূতপূর্ব সাফল্যে ভীত, সন্ত্রস্ত পুঁজিবাদী মহল উদার গণতন্ত্রের কাঠামো ছেড়ে ফ্যাসিবাদী প্রাচীরের আড়ালে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। আর তাদের রক্ষার জন্যেই ফ্যাসিবাদ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণআন্দোলন বিরোধী ও বৈদেশিক

ফ্যাসিস্ত মতবাদ

ফ্যাসীবাদ ইতালীতে বলশেভিক ধ্বংসাত্মক প্রবণতার প্রত্যুত্তর হিসেবে গড়ে ওঠে। এর প্রাথমিক কর্মসূচী ছিল শ্রমিকদের প্রতি সুবিচার, একটি শক্তিশালী পররাষ্ট্র নীতি ও জাতীয় সম্মানবৃদ্ধি। এটিকে সুসমঞ্জস মতবাদ হিসেবে ধরে নিলে ভুল হবে। গণতন্ত্রবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের মত এটি দীর্ঘ বিবর্তনের ফল নয়। মুসোলিনী ইতালীর শাসন ক্ষমতা দখল করে তার সমর্থনে একটি রাজনৈতিক দর্শনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। সেজন্য তিনি ও হেগেলীয় দার্শনিক গিওভানি জেন্টিলে এই তত্ত্ব প্রচার করেন। এই মতবাদ ছিল বহু রাজনৈতিক তত্ত্বের বিভিন্ন ছিন্ন অংশের একটি সঙ্কলন মাত্র।

সুসমঞ্জস মতবাদ নয়

ফ্যাসীবাদের মূল কথা হল, রাষ্ট্র হচ্ছে একটি স্বাধীন জৈবিক সত্তা যার নিজস্ব ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিত্ব আছে। এটি বর্তমান কালের অসংখ্য বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন ব্যক্তিদের সমষ্টিমাত্র নয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষ রাষ্ট্রের সঙ্গে গ্রথিত। সুতরাং কোন বিশেষ সময়ের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জনসমষ্টির চেয়ে অনেক বেশী স্থায়ী, গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল। সে কারণে রাষ্ট্রের লক্ষ্য তার নাগরিকদের মঙ্গল বিধান বা বৈষয়িক উন্নয়নের চেয়ে ব্যাপক। শুধুমাত্র শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা বা নাগরিকদের বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য নয়। এর কর্তব্য হল প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি করা, তার চরিত্র ও বিশ্বাস গড়ে তোলা। রাষ্ট্র হচ্ছে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, 'সার্বজনীন বিবেক" ও নৈতিকতার পূর্ণ প্রতীক। এই রাষ্ট্র প্রকৃতিগতভাবে চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাই ব্যক্তি-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের অনিবার্য প্রাধান্য—ব্যক্তিগত স্বার্থ রাষ্ট্রের উচ্চ স্বার্থের অধীন। রাষ্ট্রই চরমতম লক্ষ্য, অতএব সকলেই নিজ ব্যক্তিসত্তাকে তার অধীনে স্থাপন করবে। এ ব্যাপারে মুসোলিনীর বহু-উদ্ধৃত উক্তিটি হল, "রাষ্ট্রের মধ্যেই সমস্ত কিছু, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু নয়, রাষ্ট্রের বাইরেও কিছু নয়।" এই সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র জনগণের সামগ্রিক জীবনের নিয়ন্তা। সুতরাং এর গৌরববৃদ্ধি ও উন্নতি সকলেরই কর্তব্য। একথা বলা বাহুল্য যে, শ্রমিক ও শিল্প-মালিকদেরও সহযোগী হয়ে এই কর্তব্য পালন করতে হবে। অর্থাৎ সাম্যবাদীদের শ্রেণীসংঘাত নয়—শ্রেণীসহযোগিতার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি ও শক্তিশালী হওয়া সম্ভব।

রাষ্ট্রের স্বরূপঃ সমগ্র গ্রাসী ও কর্তৃত্বপ্রধান

ফ্যাসীবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, মানুষের যুক্তিপ্রবণতার বিরোধিতা। ফ্যাসিস্তদের মতে, মানুষ মূলতঃ যুক্তিহীন জীব। তাই মুসোলিনী বলতেন যে, মানুষের যুক্তিবাদের চেয়ে তাদের ভাবাবেগের কাছে আবেদন করেই তাদের উৎসাহ জাগ্রত করে তাদের নেতৃত্ব দান সহজ। তিনি আরও বলেছেন, জনগণ যদি একনায়ককে ভয় পায় তাহলেই তিনি তাদের ভালবাসা অর্জন করেন। কেননা জনতা শক্তিশালী ব্যক্তিদের পছন্দ করে। এইভাবে ফ্যাসীবাদ বীরপূজার তত্ত্ব প্রচার করে।

যুক্তিপ্রবণতার বিরোধিতা

এই মতবাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, গণতন্ত্রবাদ ও সাম্যনীতির বিরোধিতা।

গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভ—স্বাধীনতা, সাম্য ও গণসার্বভৌমত্ব, সমস্তই ফ্যাসিস্তরা তুচ্ছজ্ঞান করে। ফ্যাসিস্ত ধারণা হল, জাতির শক্তিসামর্থ্যের ওপর জনগণের স্বাধীনতা নির্ভরশীল। কিন্তু স্বাধীনতা "জনগণের অধিকার নয়, কর্তব্য।" স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটে প্রধানতঃ আইন ও রাষ্ট্রে। সুতরাং রাষ্ট্রের ইচ্ছার সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করলেই শুধুমাত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব। অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগের পূর্বশর্ত হল রাষ্ট্রের প্রতি অখণ্ড আনুগত্য। মুসোলিনীর মতে, সাম্য দুর্বলতা বিধায়ক ধারণা। অন্যদিকে অসাম্য "অ-নিবার্য, ফলপ্রসূ এবং শুভপ্রদ।" অসাম্য প্রকৃতিদত্ত, জনগণ সব সময়েই মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিদের দ্বারা শাসিত হয়—তাদের প্রয়োজন নেতৃত্বের এবং নেতৃত্বের গুণাবলী মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদেরই থাকে। সুতরাং অযোগ্য আপামর জনসাধারণের হাতে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব গেলে তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এই একই কারণে মুসোলিনীর মতে স্ত্রীলোকদের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ দেওয়া যায় না, তাদের স্থান গৃহকোণে। যেহেতু জনতা অযোগ্য সেইহেতু শাসন সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা তাদের দেওয়া যায় না। শাসন ক্ষমতা অর্পিত হবে স্বাভাবিক জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্পন্ন বিশিষ্টজন বা 'এলিট'-দের হাতে। সুতরাং এইভাবে নাগরিকদের শাসক ও শাসিত হিসেবে বিভক্ত করে গণসার্বভৌমত্বের তত্ত্ব অস্বীকৃত হয়েছিল এবং অভিজাততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সমর্থিত হয়েছিল। এই অভিজাতদের ঊর্ধ্বে বিরাজ করছেন দলের সর্বোচ্চ নেতা। তাঁর মাধ্যমেই কার্যকর হচ্ছে রাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা। তিনি কখনোই ভুল করেন না। তাই ফ্যাসিস্তদের শ্লোগান ছিল—"মুসোলিনী সব সময়ে অভ্রান্ত।" আবার যেহেতু তিনি অভ্রান্ত সেইহেতু রাষ্ট্রে কোন বিরোধী দল থাকতে পারে না। অর্থাৎ ফ্যাসিস্তরা একদলীয় একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী। সংক্ষেপে, এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক দল ও এক নেতা—এই ফ্যাসিস্ত শ্লোগানের মধ্যেই নিহিত আছে এর গণতন্ত্র-বিরোধিতার বৈশিষ্ট্যটি।

গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ বিরোধিতা

এই মতবাদের মৌল ধারণা ছিল যে, রাষ্ট্র শক্তি বা বল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর এই শক্তির দ্বারাই তাকে রক্ষা করতে হয়। তাই জাতীয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যুদ্ধ অপরিহার্য। মুসোলিনীর বক্তব্য ছিল, "ইতালীকে অবশ্যই সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করতে হবে, না হলে তার বিনাশ অনিবার্য। অর্থাৎ ইতালীর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। মুসোলিনীর দৃষ্টিতে যুদ্ধের মাধ্যমেই মানুষের সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। তাঁর ভাষায়, "নারীদের কাছে মাতৃত্ব যেমন স্বাভাবিক, পুরুষদের কাছে যুদ্ধও তেমনি স্বাভাবিক।" বস্তুতঃ, ফ্যাসিস্তদের দৃষ্টিতে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবিস্তার জাতীয় জীবনীশক্তির পরিচায়ক। আর এই কারণেই আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা। "আন্তর্জাতিক শান্তি কাপুরুষের স্বপ্ন"—এই তত্ত্বে ফ্যাসীবাদের প্রবল আস্থা।

সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের অপরিহার্যতা

সমালোচনা : দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে ফ্যাসীবাদের মত অগণতান্ত্রিক, সাম্যবাদবিরোধী, যুদ্ধকামী ও সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এই চিত্তোন্মাদী মতবাদ ইতালীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জার্মানী, স্পেন, চীন,

আর্জেন্টিনা ইত্যাদিতে বিস্তৃত হয়েছিল। এই মতবাদের বাস্তবায়ণের সাফল্য ছিল চমকপ্রদ। সেজন্য আজও ফ্যাসীবাদী ঝোঁক বহুদেশে বর্তমান। কিন্তু এই সাফল্য নির্বিচার শ্রদ্ধা জাগালেও তা দীর্ঘমেয়াদী হয়নি। বস্তুতঃ, ফ্যাসীবাদের জন্ম যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সমাজের ক্লেদ ও কলুষ থেকে। এটিকে কুযুক্তিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির ভন্ডামি বলা যায়। হেগেলীয় দর্শনভিত্তিক রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার হিসেবেও এটি অভিহিত হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই মতবাদ হেগেলের দর্শনকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্র তথা স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর কাছে নাগরিকদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণকেই স্বাধীনতা বলে প্রচার করে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিনাশসাধন করেছে। আবার, রাষ্ট্রই ঈশ্বর, রাষ্ট্রের গৌরবে জাতির গৌরব—হেগেলের এই মতেরই প্রায় প্রতিধ্বনি ফ্যাসিস্ত মতবাদে। তাই যুদ্ধের দ্বারা রাষ্ট্রের গৌরববৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করেছিল ফ্যাসিস্তরা। যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদকে তারা "জীবনের শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম" বলে চিত্রিত করে সমগ্র মানবসভ্যতার হন্তারক বলে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে এছাড়া, এই মতবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ উপেক্ষা করে তাদেরই ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল সংখ্যালঘুদের শাসন। ফ্যাসিস্তরা দেশের সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে যুদ্ধাভিমুখী করে সাময়িক কালের জন্য সাফল্যলাভ করেছিল, কিন্তু দেশের সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থ ব্যবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি বা ঘটানো সম্ভবও ছিল না। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাপে ইতালীয় অর্থনীতি ভেঙে পড়ে—তার সাফল্যের চমক মিলিয়ে যায়।

মুসোলিনীর আভ্যন্তরীণ নীতি